পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পরিবেশগত সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহের মোকাবিলায় দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার জন্য এবং BCCSAP, ২০০৯ এ উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠন করা হয়েছিল ২০১০ সালে। BCCSAP, ২০০৯ এ উল্লিখিত থিমেটিক এরিয়ার উপর জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অধীন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে মোট ৮টি পরিবেশবান্ধব পণ্য/ উদ্যোগে অর্থাৎ বায়োগ্যাস প্লান্ট, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি, ভার্মি কম্পোস্ট, সোলার হোম সিস্টেম, বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট, সোলার মিনি গ্রিড, জ্বালানী অদক্ষ সামগ্রী প্রতিস্থাপন এবং কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সর্বমোট ৫৩.৪০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬, জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮ জারী করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন কার্যক্রম/ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সত্তর এর দশকের শুরু থেকেই পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম কনফারেন্স (UN conference on the human environment) এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (environmental agencies) গঠন ও জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনের আওতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে ধরা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে, কিয়োটো প্রটোকল সম্পাদিত হয়, যা ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড ও গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য প্রস্তাব করেছিল। গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণকারী বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ এ দেয়া হল যা বৈশ্বিক গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ এর ৬৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বৈশ্বিক গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ এর পরিমাণ ছিল ৪৮,৯৩৯.৭১ মেট্রিক টন CO_2।

সারণি ১৫.১: বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহের গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের বিবরণ

ক্রমিক নং	দেশ	বার্ষিক মোট গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ, ২০১৮ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	শতকরা নিঃসরণ, ২০১৮ (%)
১	চীন	১১৭০৫.৮১	২৩.৯২
২	যুক্তরাষ্ট্র	৫৭৯৪.৩৫	১১.৮৪
৩	ইউরোপ	৩৩৪৬.৬৩	৬.৮৪
৪	ভারত	৩৩৩৩.১৬	৬.৮১
৫	রাশিয়া	১৯৯২.০৮	৪.০৭
৬	জাপান	১৪২০.৫৮	২.৯০
৭	ব্রাজিল	১১৫৪.৭২	২.৩৬
৮	ইন্দোনেশিয়া	৮২৮.৩৪	১.৬৯
৯	ইরান	৭৭৬.৬১	১.৫৯
১০	দঃকোরিয়া	৭৬৩.৪৪	১.৫৬

উৎসঃ CAIT Climate Data Explorer.2021, World Resource Institute.

আন্তর্জাতিক উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা

প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবিলায় অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)-এর সদস্য দেশগুলো নিয়ে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন (Conference of the Parties, COP) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনগুলোতে মূলত UNFCCC এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়।

২০১৫ সালে প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 21) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৯৫টি দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তি (Paris Agreements) শীর্ষক একটি জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি গৃহীত হয়। ২০১৬ সালে মরক্কোর মারাকেশে অনুষ্ঠিত ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (COP 22) প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এপেক্স বডি 'Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)' এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী (Paris Agreement Work Programmes) ২০১৮ সালের মধ্যে প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৭ সালে জার্মানির বনে ২৩তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP23) অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালে পোল্যান্ড এর ক্যাটোয়িচ শহরে অনুষ্ঠিত হয় ২৪তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP-24) যেখানে Paris Agreement Work Programmes গৃহীত হয়েছিল। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল দেশ কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস করার ব্যাপারে একমত হয়েছিল। এছাড়াও এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২০২৪ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পরপর প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

COP 25 চিলি সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে এবং স্পেন সরকারের লজিস্টিকাল সহায়তায় ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। COP 25-এর উদ্দেশ্য ছিল প্যারিস চুক্তির 'Rulebook' চূড়ান্ত করা- যা ২০২০ সালে কার্যকর করার জন্য একটি অপারেটিং ম্যানুয়াল এর প্রয়োজন ছিল। প্যারিস চুক্তির 'অনুচ্ছেদ ৬' এর অধীন কার্বন মার্কেট ও অন্যান্য ধরণের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে বিধিগুলি রয়েছে তা চূড়ান্ত করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আলোচনার বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ফলে জাতিসংঘের জলবায়ু প্রক্রিয়ার 'বিধি ১৬' এর আওতাধীন হয়ে তা পরবর্তী বছরে চলে যায়। ২০২১ সালের ৩১ অক্টোবর হতে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন COP-26 অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হবে প্যারিস চুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে একত্রিত করা।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকুল প্রভাবগুলোর কারণে সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী একটি বড় জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা নাজুক হয়ে উঠছে। এখানকার ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উপরে। "Headley Center for Climate Prediction and Research (HCCPR) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সালে ৪০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে।

Providing *Regional* Climates for Impact Studies (PRECIS) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০ এবং ২০৭০ সালে যথাক্রমে প্রায় ৪ শতাংশ, ২.৩ শতাংশ এবং ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে প্রতি ৩-৫ বছরে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে, অবকাঠামো, বাসস্থান, কৃষি এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ঝড় জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিতেও থাকে। 'Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC)'- এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারিয়ে যাবে।

২০১০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রণীত 'Economics of Adaptation to Climate Change: Bangladesh' প্রতিবেদন বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবিলায় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং আবর্তক ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫,৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে UNFCCC এর আওতায় 'National Adaptation Plan (NAP)' প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটি 'NAP Road Map' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ,বাংলাদেশ UNFCCC'র সক্রিয় সদস্য হিসাবে অভিযোজন ও প্রশমন খাতে বেশ কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করে 'Intended Nationally Determined Contributions (INDC)' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ এবং শিল্প (জ্বালানী সক্ষমতা)তিনটি খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে শর্তহীন অবদানের মাধ্যমে ৫ শতাংশ এবং শর্ত যুক্ত অবদানের (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) মাধ্যমে ১০ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাবে মর্মে INDC তে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত INDC বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক NDC Implementation Road Map প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বিদ্যুৎ, শিল্প ও যোগাযোগ প্রতিটি সেক্টরে NDC Sectoral Mitigation Action Plan প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত Action Plan সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

এছাড়াও, 'Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA)' তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে একটি 'Climate Change Unit' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধিকন্তু ,জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি/কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পানিসম্পদ খাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' প্রণীত হয়েছে। টেকসই পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে রূপান্তর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করা এ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া পরিকল্পনাটিতে ছয়টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। অভীষ্টগুলো হলো: (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; (খ) পানির নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি, (গ) সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; (ঘ) জলাভূমি ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা; (ঙ) অন্তঃ ও আন্ত-দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং (চ) ভূমি ও পানিসম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ সকল অভীষ্ট অর্জনের জন্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা , ২১০০'তে জাতীয় পর্যায়ে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও মিঠা পানি বিষয়ক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জলবায়ু অর্থায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে জলবায়ু অর্থায়ন কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ (আইবিএফসিআর) প্রকল্পের সহযোগিতায় অর্থ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ করে প্রথম 'জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়ন' নামে একটি বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাওয়ার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়ের উপর টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' নামে দ্বিতীয় জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এর উপর 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' নামে তৃতীয় এবং চতুর্থ জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। নির্বাচিত ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বাজেট বরাদ্দ ছিল ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ৫৬.৬৯ শতাংশ এবং এর ৭.৫৫ শতাংশ হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়ন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দ ৬.৬ শতাংশ ছিল যা ২০২০-২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার জন্য বর্তমান সরকার Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)-২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এই কর্মপরিকল্পনায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ার ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার জন্য এবং *BCCSAP* ২০০৯ *এ* উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড *(BCCTF)* গঠন করা হয়েছিল ২০১০ সালে। বিসিসিটিএফ-এর আওতায় সকল প্রকল্প বিসিসিএসএপি ২০০৯-এর থিমেটিক এরিয়াকে ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছর

থেকে শুরু করে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে সর্বমোট ৩,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

জলবায়ু সংকটে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু অর্থায়নের সর্ববৃহৎ উৎস যা জাতিসঙ্ঘের আঞ্চলিক গ্রুপ-এ প্রতিনিত্বকারী উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ হতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। বাংলাদেশের পক্ষে জিসিএফ-এ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) যা জাতীয় নির্ধারিত (designated) কর্তৃপক্ষ (এনডিএ) নামে পরিচিত। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের এনডিএ মনোনীত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬টি প্রতিষ্ঠান- Infrastructure Development Company Limited (IDCOL), পল্লী কর্মসহায়ক- ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ), পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এবং বিসিসিটিকে সম্ভাব্য National Implementing Entity (NIE)/Direct Access Entity (DAE) হিসেবে চিহ্নিত করে যাদের মধ্যে 'IDCOL' ও পিকেএসএফ জিসিএফ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ যেসব ক্ষেত্রে জিসিএফ হতে সহায়তা পাচ্ছে তা হল এনডিএ' সচিবালয়কে শক্তিশালীকরণ, জিসিএফ হতে তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, NIE হিসেবে স্বীকৃতির লক্ষ্যে সহায়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ইআরডি কর্তৃক নির্বাচিত সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের জিসিএফ স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘাটতি পর্যালোচনা ইত্যাদি। এনডিএ সচিবালয় বর্তমানে জিসিএফ-এর একটি কান্ট্রি প্রোগ্রাম এবং শক্তিশালী প্রকল্প পাইপলাইন তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে যা জিসিএফ হতে জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যবহারে বাংলাদেশের প্রস্তুতিকে জোরদার করবে। জিসিএফ এর অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পগুলো হচ্ছেঃ

- বাংলাদেশের টেক্সটাইল এবং রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) খাতের জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ি প্রযুক্তি এবং সরঞ্জামাদি বৃহৎ আকারে গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের প্রসার (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
- বাংলাদেশের বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়ানো। (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ১৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
- গ্লোবাল ক্লিন কুকিং প্রোগ্রাম - বাংলাদেশ (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততার সাথে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা বাড়ানো (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
- Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIM) (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ও টেকসই অর্থায়ন

সৌরশক্তি, বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট, এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে। পরবর্তী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০২০ সালে তহবিলটির আকার ৪০০ কোটিতে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে এটি 'পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' নামে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে মোট ৮টি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে-অর্থাৎ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি, ভার্মি কম্পোস্ট, সোলার হোম সিস্টেম, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট, সোলার মিনি গ্রিড, জ্বালানী অদক্ষ সামগ্রী প্রতিস্থাপন এবং কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সর্বমোট ৫৩.৪০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সংযোজনী ১৫.১-এ এ সংক্রান্ত তথ্যাদি দেয়া হলো।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ এবং যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও ক্রমশ বাড়ছে। মানবস্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন , যানবাহন ও কলকারখানসৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইট নির্মাণ শিল্পকে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি

জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২০১৯ সালে আইনটিকে বাস্তবসম্মতভাবে সংশোধন করে ইট' প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন-২০১৯ 'জারি করা হয়েছে। অবৈধ পরিবেশ দূষণকারী ইটভাটার বিরুদ্ধে বিগত জানুয়ারি ২০১৯ সাল হতে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ১,৪৪২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২,৩৬০ টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৫৯,২৩,৮১,৪০০/- টাকা জরিমানা আরোপপূর্বক ৫৬,২৩,৮১,৪০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও ৭৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৬১ টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

বিগত জানুয়ারি ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ৮৬টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫৮৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১৬,০৫,৫৮০.০০ জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

বায়ুদূষণ পরিবীক্ষণ, ইটভাটা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে যানজট নিরসন, পরিবহণ খাতের দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্যেশ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত "নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থনে আরও ১৫টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (C-CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৩১টি CAMS ও C-CAMS এর মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সার্বিক বায়ুদূষণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ 'বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিকল্পনা সংযোজনী ১৫.২-এ দেয়া হলো।

মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার হাইড্রোক্লোরোফ্লোরোকার্বন (এইচসিএফসি) ফেজ আউটের

কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মন্ট্রিল প্রটোকলের ফেজ আউট সিডিউল অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে ৬৭.৫% হ্রাসের লক্ষ্য নিয়ে এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (স্টেজ-২) বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালী সংশোধনী মোতাবেক hydrofluorocarbons (HFC) এবং HFC blends এর আমদানী ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Enabling Activities of Bangladesh for hydrofluorocarbons (HFCs) Phase-down (UNEP Component)" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান :শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা, শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করে থাকে। ২০০৯-২০২১ পর্যন্ত বিগত ১৩ (তের) বছরে প্রায় ৬৫,০০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ১,১০,০০০টি পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়েছে।

ইটিপি (ETP) স্থাপন: পানিদূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ইটিপি স্থাপনযোগ্য ২,৬৭৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ২,২৪৯টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে।

জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন তরল বর্জ্য প্রকৃতিতে নির্গমণ না করে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার করছে। ২০১৪ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর মোট ৬০০টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ

আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক বিগত জুলাই ২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য ৯,১৭৮টি নদী দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৪৫৪.৭৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যেসব কারখানায় সৃষ্ট শব্দের মান নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশী, সে সব শিল্পকারখানা/ প্রকল্প কার্যক্রম/ যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। জানুয়ারি ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে শব্দ দূষণের দায়ে মোট ৯৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬৬১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৭,০৭,৭০০.০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদকালে এবং ৪,৭৯৮.৪৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়-এর চারপাশের সড়কসমূহকে ও আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকাকে "নীরব এলাকা" ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে শব্দদূষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক ৬০টি সাইনবোর্ড তৈরি করা হয়েছে এবং ৬ লক্ষ ৪০ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ করা হয়েছে। ৬৪ টি জেলায় শব্দের মাত্রা পরিমাপ বিষয়ক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভাগীয় শহরসহ জেলা শহরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে ১৪৪টি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,৬২০ জনকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য ও জীবনিরাপত্তা বিধিমালা প্রণয়ন

- **জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮:** পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিগত ৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে এবং ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়। নতুনভাবে গৃহীত জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে পূর্বের ১৫টি খাতসহ আরও ৯টি খাত/ক্ষেত্রের মধ্যে পাহাড় প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা, প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন, ইত্যাদি খাতসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এ বিধৃত ২৪টি খাতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে যা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহ বাস্তবায়ন করবে।

- **বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭:** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ জারী করা হয়েছে এবং ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে তা কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি থেকে ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিগত ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে উক্ত আইনের আওতায় গঠিত কমিটিগুলোর প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে। কমিটিগুলো গঠনপূর্বক কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

- **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬:** বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার আওতায় ইসিএ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

- **জীববৈচিত্র্য সনদের ষষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদন:** জীববৈচিত্র্য সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সিবিডি সচিবালয়ে প্রতি চার বছর পরপর বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। বিগত ২০১৫ সালে জীববৈচিত্র্য সনদের ৫ম জাতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সিবিডি সচিবালয়ে দাখিল করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ৬ষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে।

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে সিবিডি সচিবালয়ে প্রতিবেদনটি দাখিল করা হয়েছে।

জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (NBSAP), ২০১৬-২০২১: জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর সদস্য দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ২০১০ সালে সিবিডি Conference of Parties- এর দশম সম্মেলনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ৫টি কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা (Strategic Goal)-এর আওতায় ২০টি অভিষ্ট নির্ধারণ (Biodiversity Strategic Planning 2011-2020) করা হয়, যেগুলোকে আইচি বায়োডাইভারসিটি টার্গেটস নামে অভিহিত করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০-এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ 'National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021') প্রণয়ন করা হয়েছে।

ব্লু-ইকোনোমি সংক্রান্ত কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর ও সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণরোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণে ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং পরিকল্পনামাফিক কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে:

- সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি
- উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
- সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রোটোকল বাস্তবায়ন করে সমুদ্রদূষণ রোধ এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশ সংরক্ষণ করা
- সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা
- সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা
- সমুদ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা।

বর্ণিত কার্যক্রমের মধ্যে 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি' এবং 'সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য "Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Eeconomy Action Plan" নামে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ (Ecologically Critical Area-ECA)

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ, সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা, ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধবংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ ইত্যাদি কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করে সরকার ইতিমধ্যে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) হিসেবে ঘোষণা করে এগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য এলাকার জনগণ এবং অন্যান্য সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে "Ecosystem based development, management and conservation of the Saint Martin's Island" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সর্বশেষ

সংশোধিত ২০১০)-এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬ জারি করেছে। বিধিমালা বাস্তবায়নে জেলা ইসিএ কমিটি, উপজেলা ইসিএ কমিটি, ইউনিয়ন ইসিএ কমিটি গঠন করা হয়েছে যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০) এর অন্যান্য অভীষ্টের ন্যায় পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৩টি অভীষ্ট সরাসরি পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত।

অভীষ্ট ১৩-এ 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ' এর কথা বলা হয়েছে। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে প্রতি ১ লক্ষ জনগণের মধ্যে মৃত্যু, নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে ৬,৫০০ জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,৫০০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। 'Disaster Risk Reduction Strategies of Bangladesh (2016-20)' প্রণয়ন করা হয়েছে।

অভীষ্ট ১৪-এ 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার' এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ অভীষ্টের অন্যতম একটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়।

এসডিজি'র অভীষ্ট ১৫-এ হচ্ছে 'স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা', মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে মোট ভূমির ২০ শতাংশ বনভূমি স্থাপন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে দেশের মোট ভূমির ১৭.৫ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। এ অভীষ্ট অর্জনে দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বনভূমির বৃক্ষ নিধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা তৈরি করা হচ্ছে এবং দুটি শকুন অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়েছে।

বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বন অধিদপ্তরে ২০১৮-১৯ এর তথ্যানুসারে সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৫,৭৫,১৯৬ হেক্টর (গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে), যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৪৫ শতাংশ। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৮,৮০,৪৯৪ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের প্রায় ১২.৭৪ শতাংশ। দেশে বনসহ বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২২.৩৭ শতাংশ। বন অধিদপ্তর বনায়ন এর মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার, উপকূলজুড়ে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বন ব্যবস্থাপনার প্রসার, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ ইত্যাদি কার্যক্রম ১৫টি বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

- ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত বাঘ সম্মেলন, সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়ার আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুসারে সুন্দরবনের বাঘ ও হরিণের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হরিণ শিকার বন্ধ, আবাসস্থলের উন্নয়ন ও নিয়মিত টহল প্রদান করে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহন এবং Tiger Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সালে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথম বারের মত বাঘ গণনা কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে একনেক কর্তৃক সুন্দরবন সুরক্ষা এবং বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত সময়ে ৮টি জাতীয় উদ্যান, ১৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৩টি ইকোপার্ক, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২টি মেরিন প্রটেক্টেড এলাকা (সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড ও সেন্টমার্টিন) এবং ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৪টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫১টি।
- জুলাই ২০১২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/ বিক্রয়কালে মোট ৩৭,১৪৮ টি বন্যপ্রাণী (তন্মধ্যে ৫৫টি উভচর, ৭৫৫টি স্তন্যপায়ী, ৮৯৩৪টি সরীসৃপ ও ২৭,৪০৪টি পাখি) উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ১১১টি মামলা দায়েরসহ ১৫৭ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য প্রণীত বন মহাপরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
- দেশের বন কার্যকরভাবে সংরক্ষণের জন্য সংশোধিত বন আইন, ২০১৯ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
- আন্তর্জাতিক বন দিবস, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস, জীববৈচিত্র্য দিবস, বাঘ দিবস ইত্যাদি উদযাপন, বৃক্ষমেলার আয়োজন, বৃক্ষরোপণে 'প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার' প্রদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন' পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপামর জনগণকে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এর ১,৭৩৮.০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে মেরিন প্রটেকক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও সেন্ট মার্টিন দ্বীপের চারদিকে ১,৭৪৩.০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে মেরিন প্রটেকক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইকোপার্ক, রক্ষিত এলাকাসমূহের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- বন, বন্যপ্রাণি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ২০০৪ সাল থেকে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবর্তন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৭ অনুমোদনের মাধ্যমে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং সামাজিক বনায়নের অধিক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ করাই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া, ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে থাকে। সংস্থাটি দেশের উদ্ভিদ সম্পদের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে।

বিএনএইচ চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫টি জেলার (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি) উদ্ভিদ জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ এবং সচিত্র ফ্লোরা রচনার জন্য 'সার্ভে অব ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং এন্ড দ্য চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৪৫,২১৬ টি উদ্ভিদ নমুনা (ডুপ্লিকেটসহ ১,৫০,০০০ টি) সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং উক্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত ২,৯১৬টি ভাস্কুলার উদ্ভিদের সচিত্র বর্ণনা সম্বলিত 'ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং এন্ড দ্য চিটাগাং *হিল ট্রাক্টস্'* শীর্ষক একটি পুস্তক তিন খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে এবং উক্ত তথ্যের ই-ডাটাবেইজ ওয়বসাইটে (bnh.flora.gov.bd) প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণিত পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি উদ্ভিদ প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, বাংলা ও ইংরেজীতে বর্ণনা, বর্তমান অবস্থা, ব্যবহার, আবাসস্থল, উদ্ভিদের সনাক্তকরণের পদ্ধতি ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত পুস্তকে বাংলাদেশের জন্য নতুন ৯২টি উদ্ভিদ প্রজাতি উদ্ভাবনের পাশাপাশি ৩৪৪ টি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি চিহ্নিতপূর্বক তাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে ।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

দেশের বন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট। দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই সংস্থাটির প্রধান কাজ। বর্তমানে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫৪টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় টেকসই সবুজ বেষ্টনী গড়ে উপকূলীয় চরাঞ্চলে কেওড়া বনের ভেতর মিশ্র ম্যানগ্রোভ সৃজনে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। এছাড়াও, বিলুপ্তপ্রায় কিছু উদ্ভিদ টিকিয়ে রাখতে নার্সারি ও বনায়ন কৌশলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৪টি চলমান এবং ১৭টি নতুন গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বনজ বৃক্ষের ১,০২,৫০০টি চারা পরীক্ষামূলকভাবে উত্তোলন করা হয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদের

৮,৫০০টি চারা পরীক্ষামূলকভাবে উত্তোলন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সুন্দরবনেও কিছু কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। যেমন:- ধুন্দল, ঝানা এবং ভাতকাঠি। উক্ত প্রজাতিসমূহের চারা প্রাকৃতিকভাবে গজানোর হারও কমে যাচ্ছে। সুন্দরবন সংরক্ষণের স্বার্থে প্রজাতি ৩টির নার্সারি এবং বনায়ন কৌশলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগে এদেশের মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ সকল দুর্যোগের মধ্যে ১৯৭০ ও ১৯৯১ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ এর আইলা ,২০১৩ এর মহাসেন ,২০১৯ এর ফণী ও বুলবুল, ২০২০ এর আম্পান, ২০২১ এর ইয়াস এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা উল্লেখ্যযোগ্য। জনদুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের অন্যতম 'ভিশন' হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ে তোলা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

আইন, নীতি, বিধি ও চুক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমণের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চাহিদা পূরণকল্পে যথাযথ আইনি কাঠামো দেয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণীত হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে প্রতিপালন এবং নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ প্রকাশ করা হয়। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকান্ডের মত আপদগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সম্প্রতি বজ্রপাত-কে অন্তভূর্ক্ত করে এবং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্তভূর্ক্ত করে এসওডি'র সংশোধন করা হয়েছে।
- উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভাগ/ সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ অনুমোদন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ Asian Disaster Reduction Centre (ADRC), Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES), Asian Ministerial Conference on Disaster Reduction (AMCDR) এবং INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) এর সদস্যভূক্ত হয়েছে।
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে।
- দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে।
- দুর্যোগ পরবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যার জন্য স্থানভিত্তিক উঁচুকরণের তথ্যনির্ভর নির্দেশনা মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এ মানচিত্র হতে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ অত্র এলাকার ঘর-বাড়ির ভিটা এবং রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচু করতে হবে তার ধারণা পাওয়া যাবে।
- কার্যকর দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে Incident Management System (IMS) সংক্রান্ত গাইড লাইন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্প পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটির জন্য পৃথক Debris Management Plan এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- জাপানের সেনদাই নগরীতে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে ১৮৭টি

দেশের উপস্থিতিতে 'সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাষ্টার রিক্স রিডাকশন' গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য এ্যাকশন প্লান তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের জন্য প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী (২০১৬-২০২০) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় SAARC সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশন ফর ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট (SAARC Plan of Action for Disaster Management) তৈরিতে সহায়তা করছে।
- ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত সাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরশন এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, তিতাস, টিএন্ডটি এবং ওয়াসা এর কন্টিনজেন্সী প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

সচেতনতা ও শিক্ষামূলক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাষ্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাষ্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমতা ও সমন্বয় আনয়নের লক্ষ্যে Harmonized Training Module এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ECRRP-D1প্রকল্পের আওতায় Damage and Need Assessment (DNA) Cell স্থাপন করা হয়েছে । দেশের ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের SoS ও D-Form Online এ পুরণ করার নিমিত্ত Damage and Need Assessment (DNA) software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ECRRP-D1 প্রকল্পের আওতায় Multi-Hazard Risk and Vulnerability Assessement (MRVA) Cell স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৮টি বড় ধরনের দুর্যোগের (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ,ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধ্বস, খরা, প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত) বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং website এ আপলোড করা হয়েছে।

দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

- **দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রেরণে মোবাইল ফোনে IVR (Interactive Voice Response) প্রযুক্তি ব্যবহার:** মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনসাধারনের বোধগম্য ভাষায় দুর্যোগের আগাম বার্তা Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতিতে প্রচার করা হচ্ছে।
- **DNA (Damage and Need Assessment) সফটওয়্যার:** দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুর্ণবাসন পরিকল্পনার জন্য ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানা জরুরি। কিন্তু মাঠ থেকে এ তথ্য পেতে বিলম্ব হয়। এজন্য অনলাইনের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য দ্রুত প্রেরন এবং বিশ্লেষণের জন্য একটি Web Based DNA সফটওয়ার তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া সফটওয়ারে Citizen Reporting সন্নিবেশিত থাকায় জনগন তার এলকার দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য এবং ছবি অনলাইনে প্রেরণ করতে পারবে। বর্তমানে এ সফটওয়ারের ব্যবহারের উপর মাঠ পর্যায়ে জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান আছে। এই

সফটওয়ারের মাধ্যমে উপজেলা থেকে সরসরি Online ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাঠানো যাবে।

- **MRVA (Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessment, Modeling and Mapping)** সেল প্রতিষ্ঠা করা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে ECRRP 2007-D1 প্রকল্পের অধীন MRVA Cell প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এ মানচিত্রগুলো ব্যবহার করে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা গ্রহন করা যাবে এবং তা সঠিক বাস্তবায়িত হলে ভবিষতে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি আরওকমে আসবে। দুর্যোগ ব্যস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে এবং জিওড্যাশ পোর্টালে MRVA এর Products গুলো প্রকাশ করা হয়েছে।
- **Cyclone Shelter Database:** উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ওয়েবসাইট ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষন করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলির কাঠামোগত এবং আনুষাঙ্গিক তথ্য যেমন: ভৌগলিক অবস্থান (অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ), ব্যবহার উপযোগিতা, ধারনক্ষমতা, ইত্যাদি সংরক্ষন করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটির তথ্য ব্যবহার করে নতুন ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মানের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা, ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনার জন্য উপযুক্ত পথ নির্ধারন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণ করা যাবে।
- **Innundated Depth Map:** দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছাসজনিত বন্যার স্থানভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর ইনআনডেশন ম্যাপ/রিস্ক ম্যাপ ফর ষ্টর্ম সার্জ তৈরি করা হয়েছে। এ ঝুঁকি মানচিত্র হতে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ এ সকল এলাকার ঘর-বাড়ির ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে, এবং রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচু করতে হবে তার ধারণা পাওয়া যাবে।
- **E-Library:** দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকাশনা এক জায়গা থেকে যাতে পাওয়া যায় সেজন্য ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী তৈরী করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেখানে দুর্যোগ সম্পর্কিত প্রায় ১০০০টি দুর্যোগ বিষয়ক প্রকাশনা ই-লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।
- **Risk Atlas (**কোন স্থানের আপদ মানচিত্র, ঝুঁকি সূচকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ঝুঁকিতে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামো ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য ভান্ডার): রিস্ক এটলাসটি একটি নিদিষ্ট উপজেলার ঝূঁকির মানচিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে সকল তথ্য দিয়ে সাহায্য করে যেগুলো হচ্ছে আপদের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি যেমন বন্যার গভীরতা ও পরিধি, জলোচ্ছাসের গভীরতা ও পরিধী, খরার চিত্র ও পরিধী এবং বিপদাপন্নতা ইত্যাদি।
- **NEOC** স্থাপন: ভূমিকম্প ও অন্যান্য মেগা ডিজাষ্টার মোকাবিলার লক্ষ্যে ঢাকা শহরে একটি অত্যাধুনিক National Emergency Operation Centre (NEOC) স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৮.০ রিক্টার স্কেলের অধিক ভূমিকম্প সহনীয় এই ভবনের জন্য অচিরেই প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবিলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ ২০০৯-১০ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত ১,০৯৩.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩৪ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে ১,০২৮.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২৫ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬৫.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে অবশিষ্ট ৯ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন বর্তমানে চলমান আছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন, বনায়ন সংক্রান্ত। এ সব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ, জলাবদ্ধতা নিরসন, পানির সহজলভ্যতা ও সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার ফলে প্রকল্পের উপকারভোগী জনগণের জীবনমানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাৎসরিক বন্যা মৌসুম

২০২০ সালের বন্যায় সারাদেশে (হাওর অঞ্চল ব্যাতীত) বাপাউবো'র বাঁধের ৯৩৯টি স্থানে মোট ১৬১.২৪৮ কিঃমিঃ

ভাঙন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৫৬৮টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭২.৮১৬ কিঃমিঃ বাঁধ আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করা হয়। বন্যায় সারাদেশে বাপাউবো'র বাস্তবায়িত ১,২৮৭ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ১৬০টি স্থানে মোট ১০.০৬০ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে, ১৯৪টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭.৬১৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ভাঙন কবলিত স্থান আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করে ভাঙন মোকাবিলা করা হয়।

এছাড়া নদী তীরে অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে অতীতে কখনো নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এরূপ উন্মুক্ত নদী তীরের ৭২৫টি স্থানে মোট ১৯৩.৬৫১ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর ভাঙন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৮১৭টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৫.২৮৩ কিঃমিঃ আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে নদী তীর ভাঙন প্রতিহত করা হয়।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা মোকাবিলা

বাপাউবো'র পরিচালন বাজেট হতে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালে ১,০৯০টি পিআইসি দ্বারা সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে প্রায় ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৮১৯ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত করা হয়।

১০ মে ২০২১ সাল নাগাদ হাওর এলাকায় শতভাগ ফসল কাটা সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ফসল পাহাড়ী ঢল ও অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ডেল্টা প্লান-২১০০

"বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ মূলত একটি অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা যা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে No Regret পলিসিতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ তে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু, টেকসই ও সমন্বিত ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সামগ্রীক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ।

শতবর্ষ এই ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল- এ রকম মোট ৬টি হটস্পট নির্ধারণ করে সেখানে ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩,১৪,৫০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে যার প্রায় ৮০% বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে জিডিপি'র ২.৫০% বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

সংযোজনী

সংযোজনী ১৫.১
টেকসই অর্থায়ন ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

২০২১-২০২২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক টেকসই অর্থায়ন এবং পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫৯৩৫.৫৭ কোটি টাকা এবং ৩৫৬৪.৮৫ কোটি টাকা। উল্লিখিত সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো Environmental and Social Risk Management (ESRM) Guidelines অনুযায়ী রেটিংকৃত ৯৪৬০৯টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৬৬২.৫২ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক তাদের নিজস্ব জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল হতে ৩৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

সৌরশক্তি, বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট, এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে। পরবর্তী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০২০ সালে তহবিলটির আকার ৪০০ কোটিতে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে এটি 'পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' নামে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে মোট ১০ (দশ) টি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে-অর্থাৎ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, গ্রিন বিল্ডিং, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি, ভার্মি কম্পোস্ট, সোলার হোম সিস্টেম, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট, নেট মনিটরিং রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন, জ্বালানি দক্ষ সামগ্রী প্রতিস্থাপন, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন প্রকল্প স্থাপন ও উন্নয়ন এবং কারখানার কর্মপরিবেশ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সর্বমোট ৫৩.৪০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

কার্বন নির্গমন ও দূষিত বস্তুকনা হ্রাসসহ জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের ইটভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকে জুন ২০১২ সালে Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project শীর্ষক একটি প্রকল্প গঠন করা হয়েছে। আবর্তনশীল রিলেন্ডিং প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটিতে এডিবি'র আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা)। এ প্রকল্পের দু'টি ভাগ রয়েছেঃ পার্ট-এ (Ordinary Capital Resources) এর জন্য Fixed Chimeny Kiln (FCK) হতে Improved Zig-zag Kiln এ রূপান্তর/উন্নয়ন (রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমান ৩০.০০ মিলিয়ন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা) এবং পার্ট-বি (Special Funds Resources) এর জন্য Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) এবং Tunnel Kiln প্রযুক্তিতে ইটভাটা নির্মাণ (রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমান ২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা)। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২০টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ১৯টি উপপ্রকল্পের মাধ্যমে ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান ৪০৭.৯৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শতভাগ ঋণ বিতরণসহ প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির আবর্তনশীল পর্যায়ের কার্যক্রম দুইটি সময়-সীমায় পার্ট-এ ২৫ বছর মেয়াদে এবং পার্ট-বি ৩২ বছর মেয়াদে চলমান রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য টেকসই ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনের হার নির্ণয়ের ভিত্তি নির্ধারণ এবং সাসটেইনেবিলিটি রেটিং এর বিদ্যমান ম্যাথোডোলজি-তে নতুন ৯টি কম্পোনেন্ট সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনকল্পে 'রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১'-এর আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক 'টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট/আপ-গ্রেডেশন ফান্ড' নামে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এ তহবিলের আওতায় টাকা ৯.১২ কোটি বিতরণ করা হয়েছে।
- পরিবেশবান্ধবতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খাত নিরপেক্ষভাবে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারক কর্তৃক মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির বিপরীতে অর্থায়নের নিমিত্তে গঠিত 'গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড (জিটিএফ)' হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১৩৪.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪৫.২২ মিলিয়ন ইউরো পুনঃ অর্থায়ন করা হয়েছে।
- সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় গঠিত 'বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' শীর্ষক তহবিল হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ২৬০টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪৯.৭৬ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে অনুমোদন হয়েছে।

সংযোজনী ১৫.২
বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিকল্পনা

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ একটি ক্রসকাটিং ইস্যু, তাই সরকার সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্তা ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ

স্বল্প মেয়াদি

- গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানকালে গাড়ীর নিঃসরণ মাত্রা পরীক্ষা নিশ্চিত করা
- চলমান উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- নির্মাণ সামগ্রী যেমন মাটি/বালি/সিমেন্ট ইত্যাদি উন্মুক্ত ট্রাকে পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করা
- সকল ক্ষতিগ্রস্থ ও ভাঙ্গা রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামত করা
- সকল পৌরবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ও বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করা
- ঢাকার আশে পাশে সকল অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা
- বায়ুদূষণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট ও কঠোর এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা
- রাস্তার পাশে অনাবৃত স্থান কংক্রিট দিয়ে আবৃত করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়

মধ্য মেয়াদি

- যানবাহন সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণে দূষণ সৃষ্টিকারী অধিক পুরাতন গাড়ী ঢাকার রাস্তা হতে প্রত্যাহার করা
- ব্যাক্তিগত গাড়ী ব্যবহার হ্রাস করে গণপরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা
- হাইব্রিড/ইলেকট্রিক যানবাহন আমদানি ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা
- সকল প্রকার জ্বালানি ও গাড়ীর নিঃসরণ মাত্রা এবং গাড়ীর ইঞ্জিন মান (ইউরো-৩/৪) পযালোচনা করে যুগোপযোগিতা নির্ধারণ করা
- বর্জ্য ব্যবস্থানার লক্ষ্যে আধুনিক স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রতিষ্ঠা করা
- ঢাকার আশে পাশের সকল অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করা
- বাযুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইমিশন ইনভেনটরি তৈরি করা
- সরকার ঢাকা শহরের বায়ুদূষণপ্রবণ (Hot spot) এলাকায় স্থায়ী পানির ফোয়ারা (High Speed Water Sprinkler) স্থাপন করা যা অনেক উপর থেকে উচ্চ গতিতে water sprinkle করে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করবে
- ধুলা চোষক (Dust sucker) স্থাপন করা
- রাস্তা পরিস্কারের জন্য ম্যানুয়াল ঝাড়ুর পরিবর্তে ভেকুয়াম সুইপিং ট্রাকের ব্যবস্থা করা

দীর্ঘ মেয়াদি

- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকায় যুগোপযোগী যাতায়াত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করে এগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা
- বায়ুদূষণ রোধে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
- বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি এবং জনবলের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা।